আধুনিক যুগ-০৭

আবুল ফজল

আবুল ফজল (১ জুলাই ১৯০৩-৪ মে ১৯৮৩) বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং রাষ্ট্রপতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি মূলত একজন চিন্তাশীল ও সমাজমনস্ক প্রবন্ধকার। তার প্রবন্ধে সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে গভীর ও স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। *

তিনি ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' (১৯২৬) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ।

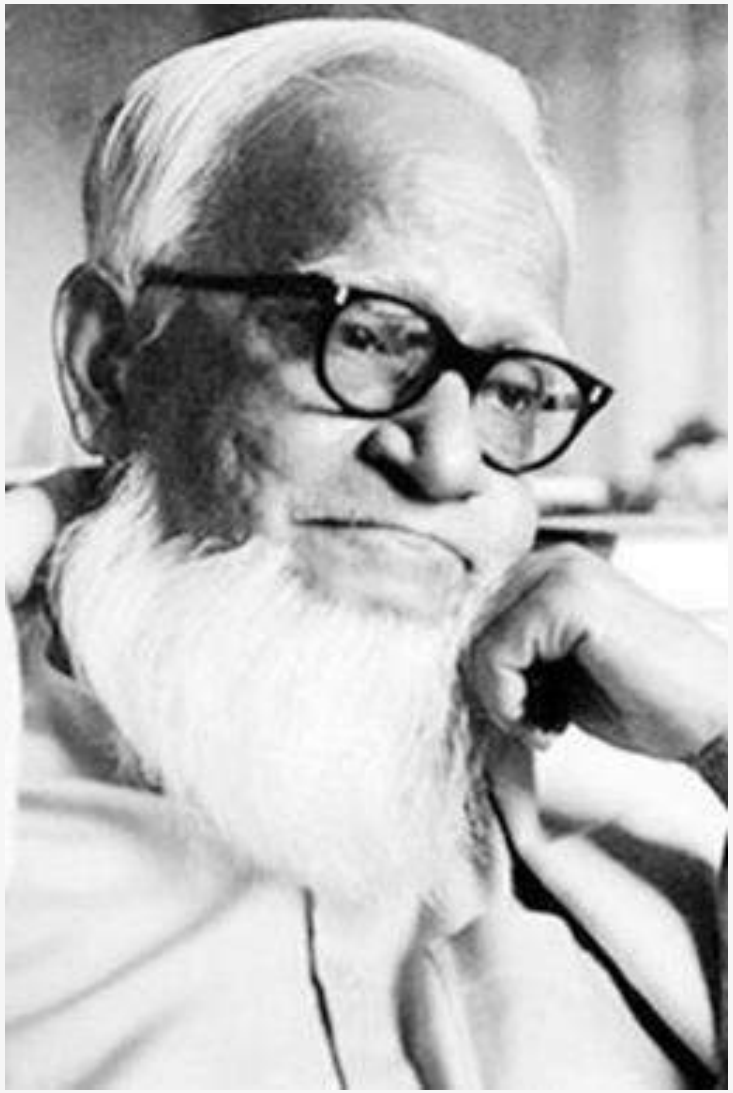

আবুল ফজল

- তাঁকে মুক্ত বুদ্ধির চির সজাগ প্রহরী বলা হয়।
- তিনি **'বুদ্ধির মুক্তি'** আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ।
- বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মূলকথা ছিল :

  "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব ।"

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন

জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের **অধ্যাপক আবুল হুসেনের** নেতৃত্বে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার মুসলমান সমাজের যে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও কুপ্রথা বিরাজমান ছিল, সেসব দূরীকরণই ছিল এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। এই সমাজ তাদের মুখপত্র হিসেবে **'শিখা'** নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করত, যার প্রতিটি সংখ্যায় লেখা থাকত **'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'**। প্রথম সম্পাদক : আবুল হুসেন । পত্রিকার ৫ম সংখ্যা (১৯৩১) সম্পাদনা করেন **আবুল ফজল** ।

কলকাতার দি বেঙ্গলি পত্রিকা সাহিত্য সমাজের এই আদর্শকে বুদ্ধির মুক্তি নামে অভিহিত করে। আবদুল ওদুদ তাঁর এক প্রবন্ধে 'বুদ্ধির মুক্তি' শব্দটি উচ্চারণ করেন। এসব থেকেই একসময় মুসলিম সাহিত্য সমাজের আন্দোলনই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন গঠিত হয় কয়েকজন আলোকিত মানুষের উদ্যোগে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন **কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল কাদির, আবুল ফজল** প্রমুখ। তাঁরা ছিলেন যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক। মুসলমানদের কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তি ও জ্ঞানের রাজ্যে আহ্বান করাই ছিল এই গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন

১৯২১ সালে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর পরই তা পরিণত হয়েছিল মুক্তবুদ্ধি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে। ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল (বর্তমান সলিমুল্লাহ মুসলিম হল) ছাত্র-সংসদের অফিস রুমে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন।

কয়েকজন ছাত্র-শিক্ষক এবং জ্ঞানবোদ্ধার মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম সাহিত্য সমাজ। এর মুখপত্র ছিল শিখা পত্রিকা। আবুল হুসেন ছাড়াও শিখা গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭- ১৯৮১), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬), আবদুল কাদির (১৯০৬- ১৯৮৪), কাজী আনোয়ারুল কাদির (১৮৮৭-১৯৪৮) প্রমুখ।

বাঙালি মুসলমানদের সার্বিক মুক্তির আশায় জ্ঞানচর্চার প্রসারই ছিল এই সমাজের মূল উদ্দেশ্য। জ্ঞান আর মুক্তবুদ্ধির চর্চার মধ্য দিয়ে সাহিত্য সমাজের হাত ধরে শুরু হয় প্রগতির পথে নতুন যাত্রা **'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'**।

উপন্যাস

- চৌচির (১ম উপন্যাস)
- রাঙ্গা প্রভাত(১৯৫৭)
- সাহসিকা
- প্রদীপ ও পতঙ্গ(১৯৪০)
- জীবন পথের যাত্রী
- পরিবর্তন

চৌচির (১ম উপন্যাস)

আবুল ফজলের রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ হল 'চৌচির'।

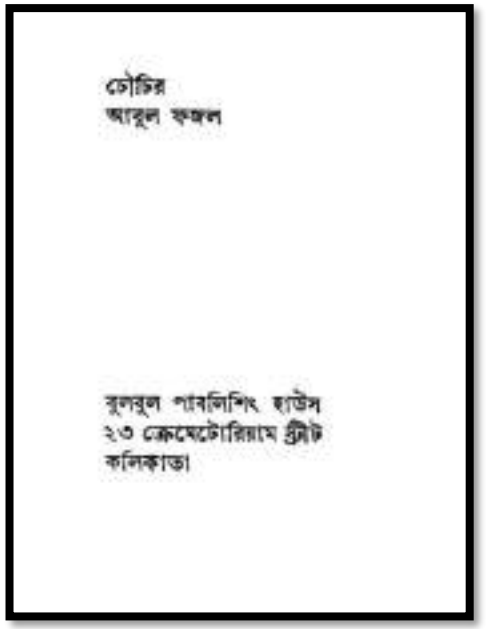

এই 'চৌচির' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক বাংলার বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর **নারী সমাজের দুর্দশাময় করুণচিত্র** আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

বাংলাদেশের সমাজে শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সমগ্র নারী সমাজকে এক ভয়ঙ্কর অসহনীয় অবস্থার দিকে। ঠেলে দেয়, তার জ্বলন্ত নিদর্শন আমরা **'চৌচির'** উপন্যাসের মধ্যে পাই।

প্রবন্ধ

- বিচিত্র কথা
- সমকালীন চিন্তা
- সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র
- সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা
- মানবতন্ত্র
- সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন

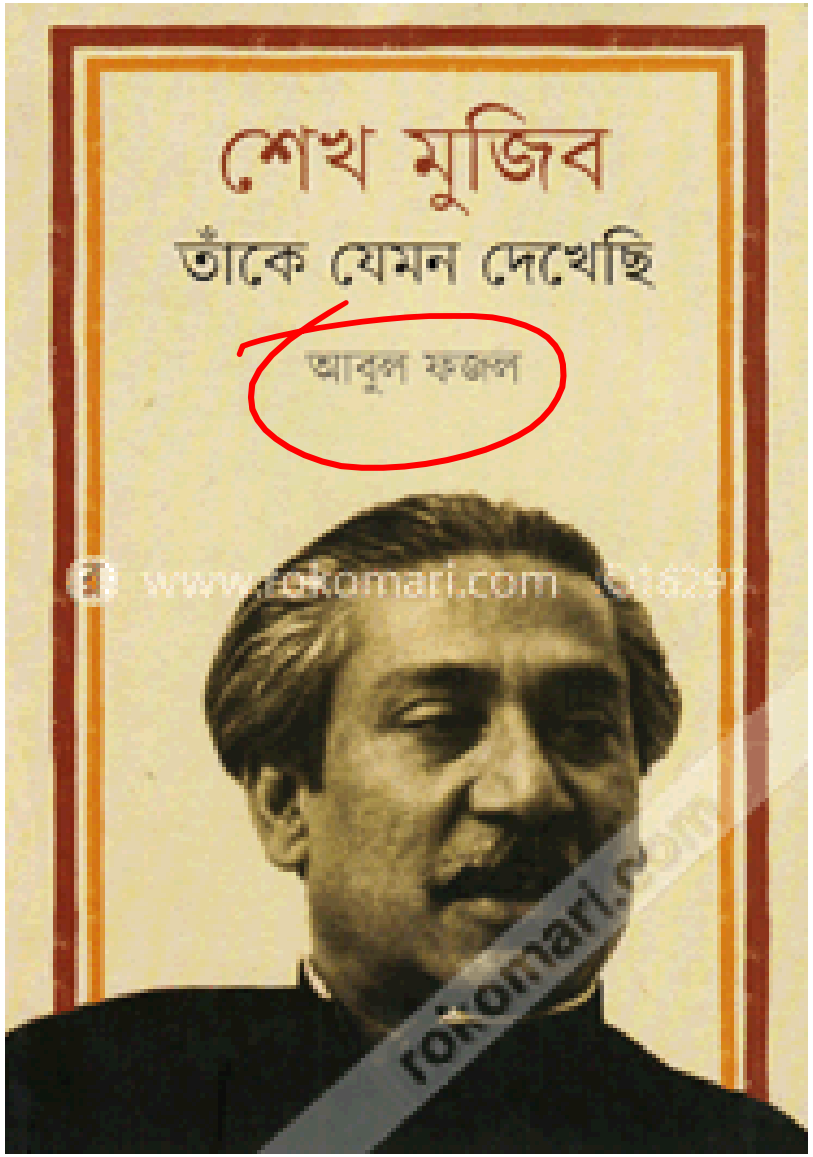

জীবনী ও স্মৃতিকথা

১) শেখ মুজিব: তাঁকে যেমন দেখেছি

২) সাংবাদিক মুজিবর রহমান

আত্মকাহিনি

দুর্দিনের দিনলিপি (১৯৭২)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁর বাসভবন ‘সাহিত্য নিকেতনে’ চট্টগ্রামের সর্বশ্রেণির বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীরা মিলিত হয়ে গড়ে তোলেন ‘শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সংঘ’। আবুল ফজল এই সংঘের পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি আত্মগোপন করেন এবং **দুর্দিনের দিনলিপি** রচনা করেন

রেখাচিত্র (১৯৬৬)

তার স্মৃতিচারণ বিষয়ক গ্রন্থ ‘রেখাচিত্র’তে পিতার বিষয়ে স্মরণ করছেন। পিতার নির্দেশে তিনি ওকালতি পাঠ বাদ দিলেও বাংলা ভাষায় লেখালেখি বাদ দেননি। এর মাধ্যমে তিনি বংশ পরম্পরায় চলে আসা গোঁড়া রীতি ভেঙে দিলেন।

বিহারীলাল চক্রবর্তী

জন্ম: ১৮৩৫, কলকাতায়।

মৃত্যু: ১৮৯৪ কলকাতায়।

পারিবারিক পদবী: চট্টোপাধ্যায়

বিহারীলাল চক্রবর্তী

গীতিকবিতার প্রবর্তক

উপাধি: ভোরের পাখি, বাংলা গীতি কবিতার জনক

বিহারীলাল চক্রবর্তী

বিহারীলাল চক্রবর্তী-ই প্রথম যিনি কবিতায় নিজের মনের কথা বলেছেন। তার আগে কবিতায় এমন ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায় নি। **তিনি মহাকব্যের যুগে প্রথম সচেতন গীতিকবি।**

পরবর্তীতে অনেকেই তাকে অনুসরণ করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাদের মধ্যে একজন। রবীন্দ্রনাথ তাকে **'ভোরের পাখি'** বলে আখ্যায়িত করেন।

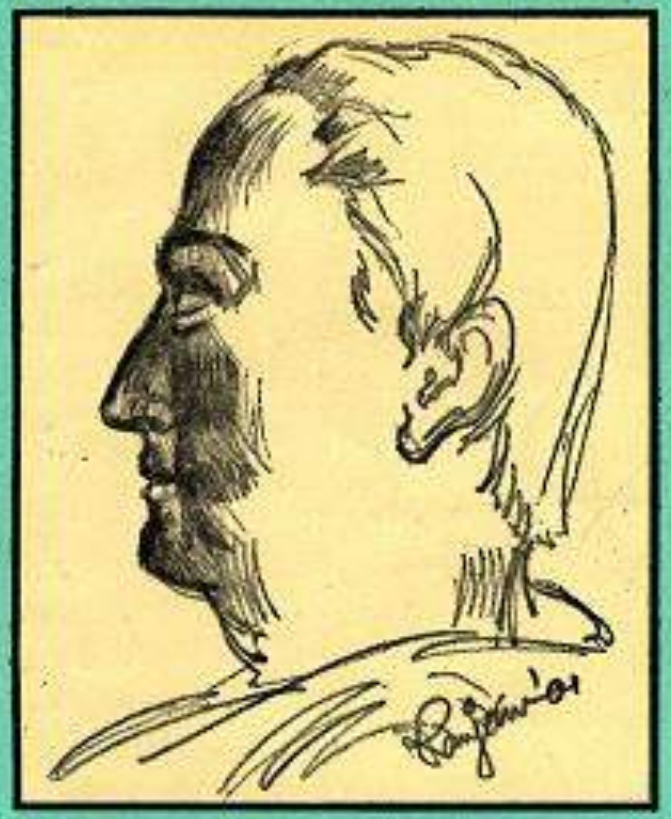

বিহারীলাল চক্রবর্তীর
শ্রেষ্ঠ কবিতা

বিহারীলাল চক্রবর্তী: সাহিত্যকর্ম

১। স্বপ্নদর্শন

২।সঙ্গীত শতক

৩। বঙ্গসুন্দরী

৪। নিসর্গ সন্দর্শন

৫। বন্ধু বিয়োগ

৬। প্রেম প্রবাহিনী

৭। সারদা মঙ্গল

৮। সাধের আসন

৯। মায়াদেবী

১০। ধূমকেতু

১১। নিসর্গসঙ্গীত

১২। বাউল বিংশতি

১৩। গোধূলি।

বিহারীলাল চক্রবর্তী: কাব্য

- স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮)। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতিকাব্য।
- সারদামঙ্গল (১৮৭৯) তার শ্রেষ্ঠ রচনা।
- বঙ্গসুন্দরী
- সাধের আসন (১৮৮৯): সারদামঙ্গল কাব্যের পরিশিষ্ট ‘সাধের আসন'। বিহারীলালের ‘সারদামঙ্গল' কাব্য পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৌদি কাদম্বরী দেবী নিজের হাতে একটা আসন বুনে কবিকে উপহার দিয়েছিলেন। আসনের উপর প্রশ্নচ্ছলে কার্পেটের অক্ষরে লেখা ছিল 'সারদামঙ্গল’ কাব্যের কয়েকটা লাইন। এর উত্তরে কবি রচনা করেন একটি কাব্য। কাদম্বরী দেবীর উপহারের কথা স্মরণ করেই বিহারীলাল এ কাব্যের নামকরণ করেন ‘সাধের আসন'।

বিহারীলাল চক্রবর্তী: কাব্য

- **স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮):** বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতিকাব্য।
- **সারদামঙ্গল:** 'সারদামঙ্গল' কাব্য (১৮৭৯খ্রীস্টাব্দে) কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর লেখা। এর মধ্যে তিনি দেবী সারদা বা সরস্বতীর অপূর্ব রোমান্টিক সৌন্দর্য মূর্তি নির্মাণ করেছেন। বাল্মীকি ক্রৌঞ্চ বধের শোকের মুহূর্তে সরস্বতীর কৃপা লাভ করেছিলেন, কবিও তেমনি দেবী সরস্বতীর প্রসাদ প্রার্থনা করেছেন। দেবী সরস্বতীর সঙ্গে কবির বিরহ মিলনের অশ্রুভারাতুর ও আনন্দ বেদনার বিভিন্ন মুহূর্তগুলি এই কাব্যে রোমান্সের রঙে ও অতীন্দ্রিয় ভাব-ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়েছে। কবি সরস্বতীকে কখনও জায়া জননীরূপে, কখনও অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির মধ্যে অনুভব করতে চেয়েছেন। এই কাব্যখানি ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিকুলের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'সারদামঙ্গল' কাব্যে কবি দেবী সরস্বতীর প্রেম, করুণা ও সৌন্দর্য্যের আদর্শ প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। এটি তার শ্রেষ্ঠ রচনা।

বিহারীলাল চক্রবর্তী: কাব্য

- **বঙ্গসুন্দরী:** "বঙ্গসুন্দরী" (১৮৭০) তাঁর প্রথম স্বার্থক গীতিকাব্য "বঙ্গসুন্দরী" (১৮৭০)। এই কাব্যটি দশটি সর্গে বিভক্ত। কবি এই কাব্যে বঙ্গ নারীর বন্দনা করেছেন।
- **সাধের আসন** (১৮৮৯): সারদামঙ্গল কাব্যের পরিশিষ্ট 'সাধের আসন'। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্য পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৌদি কাদম্বরী দেবী নিজের হাতে একটা আসন বুনে কবিকে উপহার দিয়েছিলেন। আসনের উপর প্রশ্নচ্ছলে কার্পেটের অক্ষরে লেখা ছিল 'সারদামঙ্গল' কাব্যের কয়েকটা লাইন। এর উত্তরে কবি রচনা করেন একটি কাব্য। কাদম্বরী দেবীর উপহারের কথা স্মরণ করেই বিহারীলাল এ কাব্যের নামকরণ করেন 'সাধের আসন'।

রাজা রামমোহন রায়

Raja Ram Mohan Roy

জন্ম: ১৭৭২ হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে।

মৃত্যু: ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে। সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়।

তিনি সমাজ ও ধর্ম সংস্কারক, চিন্তাবিদ, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত।

১৮৩০ সালে মোগল বাদশা (দিল্লীর সম্রাট) দ্বিতীয় আকবর তাঁকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন ।

ছদ্মনাম- শিবপ্রসাদ রায়

রাজা রামমোহন রায়

Raja Ram Mohan Roy

একেশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করে তিনি যে ধর্মমত প্রবর্তন করেন তার নাম 'ব্রাহ্মধর্ম'।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অন্যান্যদের সহায়তায় 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন : ২০ আগস্ট ১৮১৮ সালে ।

রামমোহন রায়ের অনুরোধ ও প্রচেষ্টায় তৎকালীন লর্ড বেন্টিংক ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন।

রাজা রামমোহন রায়

তিনি ইংল্যান্ড গমনকারী প্রথম বাঙালি ব্যক্তি।

বাংলা গদ্যকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে প্রথম ব্যবহার করেন রামমোহন রায় ।

তিনি বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচয়িতা। তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বাঙালি রচিত প্রথম ব্যাকরণগ্রন্থ ।

তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রবন্ধ রচয়িতা ।

প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ: 'বেদান্তগ্রন্থ'(১৮১৫)

রাজা রামমোহন রায় রচিত গ্রন্থ

- বেদান্তগ্রন্থ
- বেদান্তসার
- গৌড়ীয় ব্যাকরণ

সম্পাদিত পত্রিকা	ব্রাহ্মণ সেবধি
	সম্বাদ কৌমুদী

সুকান্ত ভট্টাচার্য

১৯২৬-১৯৪৭

- জন্ম: কলকাতার কালীঘাটে
- মৃত্যু: মাত্র ২১ বছর বয়সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে

সুকান্ত ভট্টাচার্য

উপাধি

কিশোর কবি

কাব্যগ্রন্থ

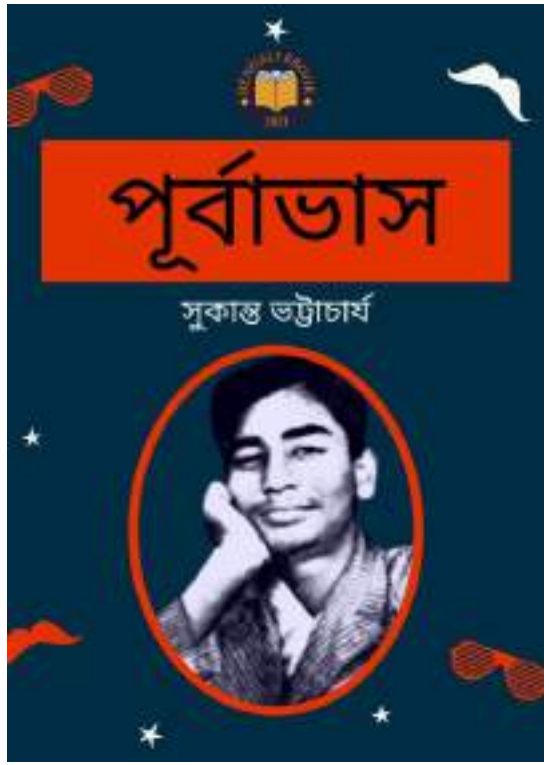

- ছাড়পত্র
- অভিযান
- ঘুম নেই
- হরতাল
- পূর্বাভাস
- গীতিগুচ্ছ
- মিঠেকড়া

সুকান্ত: বিখ্যাতউক্তি

এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার অঙ্গীকার।

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি, জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি।

সাবাস, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়, জ্বলে পুড়ে-মরে ছাড়খার তবু মাথা নোয়াবার নয়। (দুর্মর)

হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ কেঁপে কেঁপে উঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে।

আবুল মনসুর

জন্ম : ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮, ধনিখোলা গ্রাম, ময়মনসিংহ ।

মৃত্যু : ১৮ মার্চ ১৯৭৯, ঢাকা ।

সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিক

তিনি খেলাফত, অসহযোগ ও স্বরাজ আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন ।

স্মৃতিকথা

আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু

শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু

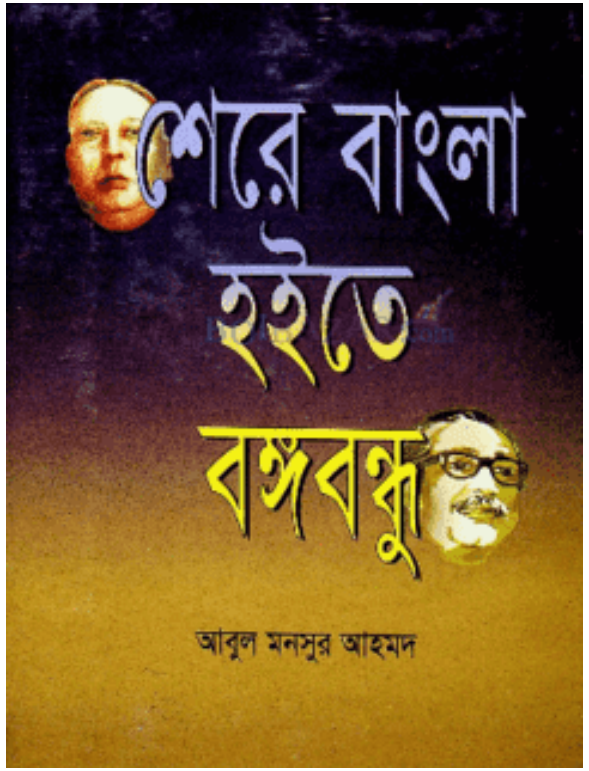

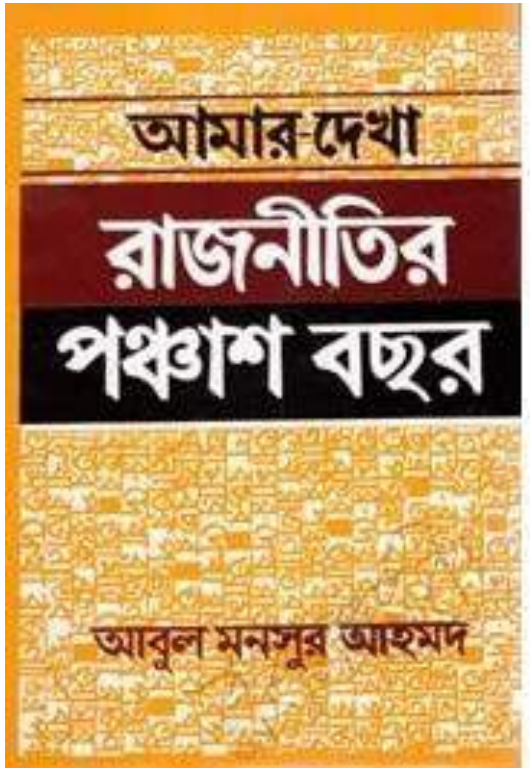

গল্পগ্রন্থ

১) আয়না (১৯৩৫)

২) ফুড কনফারেন্স (১৯৪৪) এ দুটি ব্যঙ্গাত্মক গল্পগ্রন্থ ।

৩)গালিভারের সফরনামা (১৯৫৩, শিশুতোষ),

৪) আসমানী পর্দা (১৯৬৪)।

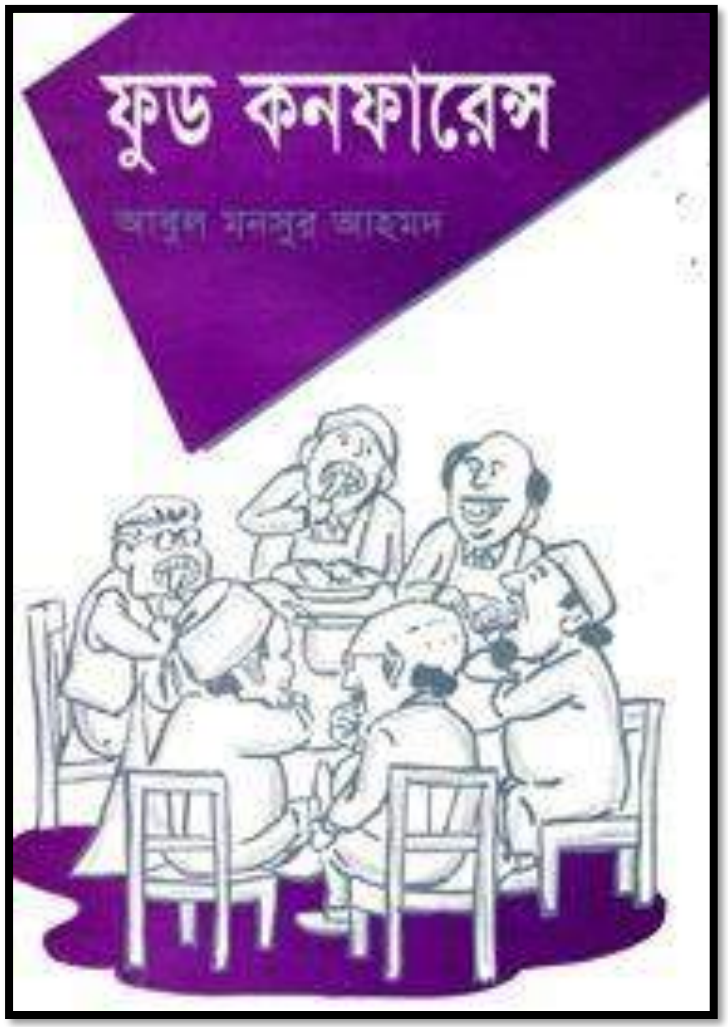

ফুড কনফারেন্স

'ফুড কনফারেন্স' আবুল মনসুর আহমেদের শ্রেষ্ঠ পলিটিক্যাল স্যাটায়ার।

এতে রয়েছে বিভিন্ন স্বাদের নয়টি ছোটগল্প। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ফুড কনফারেন্স, সায়েন্টিফিক বিযিনেস, লঙ্গরখানা, গ্রো মোর ফুড, জমিদারি উচ্ছেদ ইত্যাদি। প্রতিটা গল্পই ভিন্ন স্বাদের, কিন্তু মূল ভাবধারা এক। **তা হলো, সমাজের সুবিধাবাদী, স্বার্থান্বেষী রূপ।** গল্পগুলোর সময়কাল বাংলা **১৩৫০-১৩৫৪ সাল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর উপমহাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এর উপজীব্য।** দুর্ভিক্ষে মানুষের মানবেতর জীবন তার সাথে সাথে ক্ষমতাসীনদের স্বার্থপরতা, উদাসীনতা ক্ষেত্রবিশেষে নির্বুদ্ধিতা, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার- এ সবই ফুটে উঠেছে গল্পগুলোতে। সময়কাল আজ থেকে বহু বছর আগে হলেও, আজও এর গল্পগুলো ঠিক একইরকম প্রাসঙ্গিক।

যে গল্পের নামানুসারে এই বই সেই 'ফুড কনফারেন্স' গল্পে দেখা যায় সমসাময়িক দুর্ভিক্ষের বাস্তব চিত্র। **সেখানে শেরে-বাংলা, মহিষে বাংলা, সিংগীয়ে বাংলা, কুত্তায় বাংলা** ইত্যাদি চরিত্রের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন, সমাজের সাধারণ মানুষের যে সমস্যা, দুঃখ-দুর্দশা, দুর্ভিক্ষ- তাতে নীতিনির্ধারক পর্যায়ের নিষ্ঠুর উদাসীনতা।

সমাজের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে কিছু অবাস্তব নীতি নির্ধারণ, সমাজের মূল সমস্যাকে চিহ্নিত করার অনীহা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, মিটিং-কনফারেন্সের নামে অহেতুক কালক্ষেপণ আর ভোজনবিলাস- এরকম নানা অসংগতি। একপর্যায়ে এসব জটিল সমস্যা সমাধান করতে না পারার **দরুন দুর্ভিক্ষে মানুষের করুণমৃত্যু** এবং সমাজে মানুষহীন হয়ে যাওয়ার শেষ পরিণতি।

উপন্যাস

- সত্যমিথ্যা (১৯৫৩, ভাবানুবাদ),
- জীবনক্ষুধা (১৯৫৫),
- আবে হায়াত (১৯৬৮) ।

স্মৃতিকথা

আত্মকথা (১৯৭৮)।

আবদুল্লাহ আল মামুন

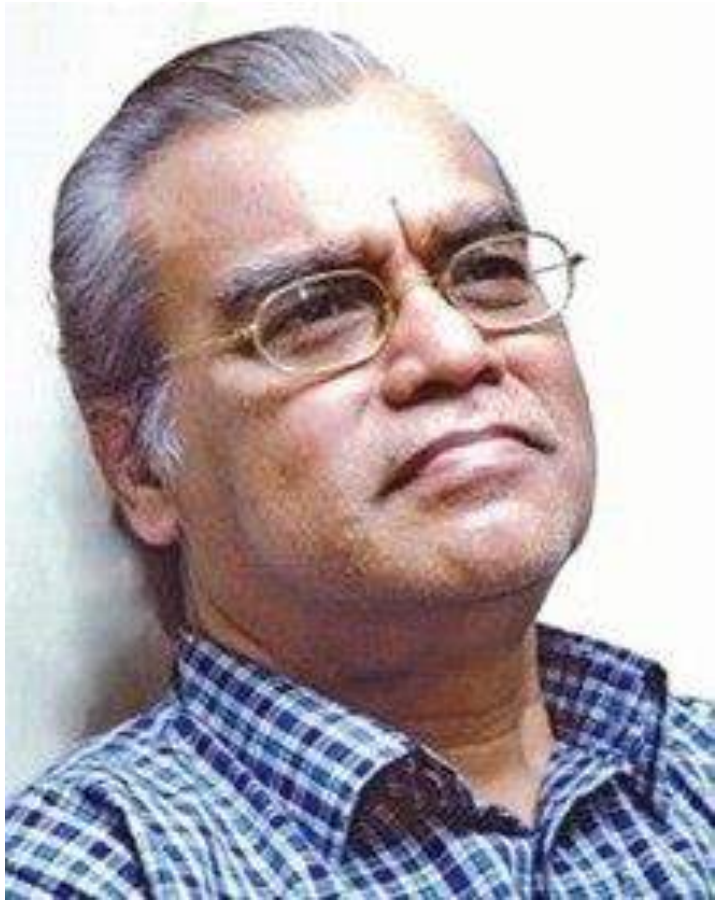

- আবদুল্লাহ আল মামুন ১৯৪৩ সালের ১২ জুলাই জামালপুর জেলা সদরের আমলা পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

- তিনি মূলত নাট্যকার ও নাট্যাভিনেতা।

নাটক: সুবচন নির্বাসনে

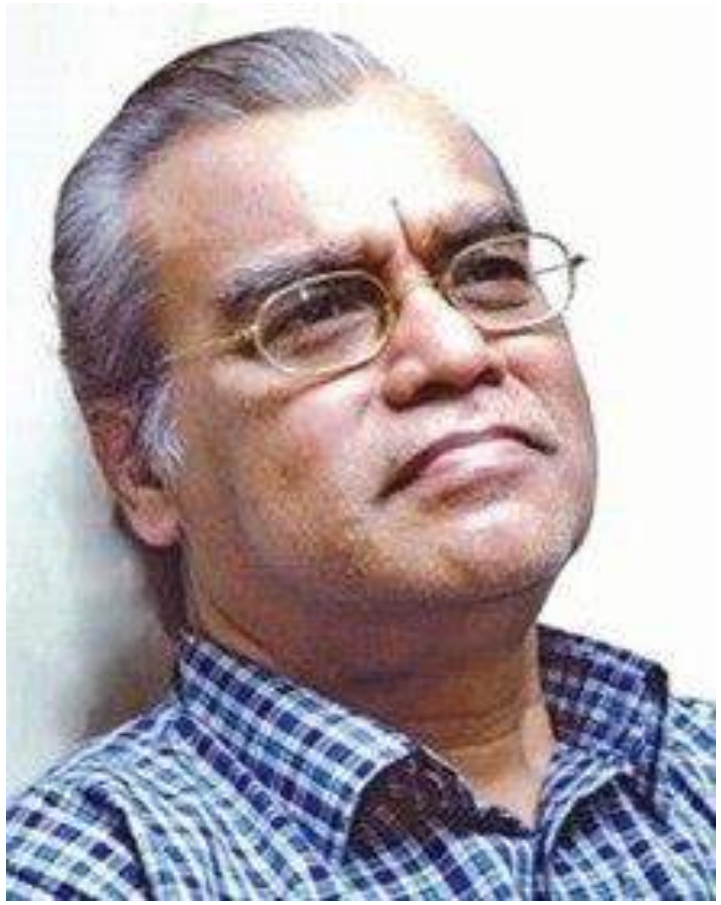

- **সুবচন নির্বাসনে :** আব্দুল্লাহ আল মামুনের 'সুবচন নির্বাসনে' (১৯৭৪) একটি মঞ্চ সফল জনপ্রিয় নাটক। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সমাজে যে মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়, তাকে কেন্দ্র করেই নাটকটি রচিত হয়েছে।

- নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে- স্কুল শিক্ষক বাবা, বড় ছেলে খোকন, ছোট ছেলে তপন এবং মেয়ে রানু। আদর্শবান স্কুল শিক্ষকের সন্তানেরা বাবার আদর্শকে ধারণ করে জীবনে চলতে গিয়ে হোঁচট খেতে খেতে বুঝতে বাধ্য হয় বাবার শিখানো নীতিবাক্যগুলো ঘুনেধরা সমাজে অচল। বড় ছেলে খোকন বি,এ, পাশ করে চাকরী খুঁজতে গিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাকে পুলিশে দেওয়া হয়। ছোট ভাই তপন এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সে বেপরোয়া হয়ে উঠলে তাকেও পুলিশ খোঁজে। অন্যদিকে মেয়ে রানুর কেরানী স্বামী অফিসের বসের অনৈতিক বাসনা পূরণ করতে বলে। কিন্তু বাবার শিখানো সততার কাছে, হার না মেনে সে স্বামী সংসার ত্যাগ করে চলে আসে। **স্কুল-মাষ্টার সারাজীবন যে আদর্শে ছেলেমেয়েদের বড় করে তুলেছেন, সে আদর্শের জন্য প্রতিটি ছেলে মেয়ে সমাজে অচল হয়ে গেছে।**

P2A

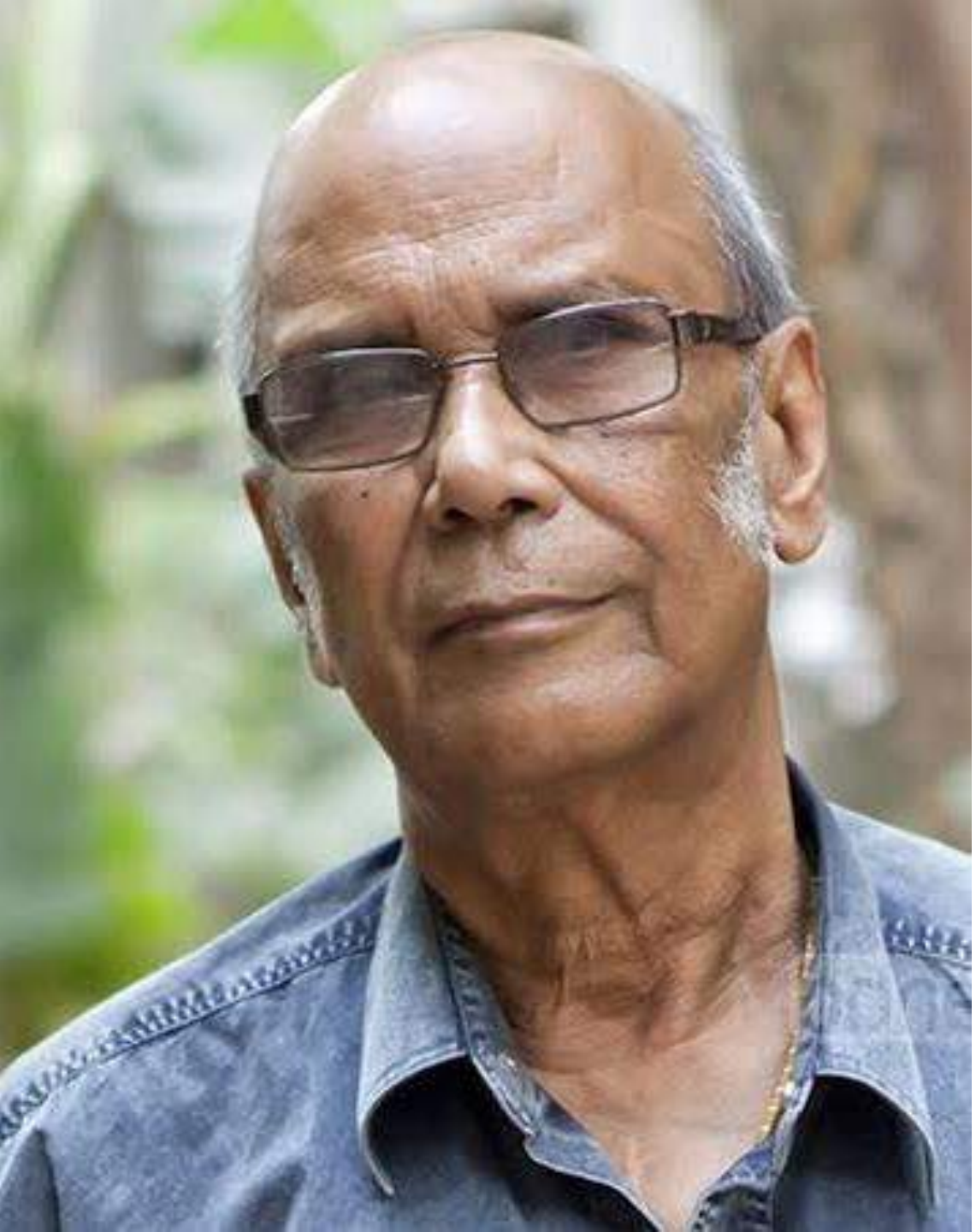

সৈয়দ শামসুল হক

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫, কুড়িগ্রাম।

মৃত্যু : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬, ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে ।

তাঁকে সব্যসাচী লেখক বলা হয়। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, অনুবাদ তথা সাহিত্যের সকল শাখায় সাবলীল পদচারণার জন্য তাকে 'সব্যসাচী লেখক' বলা হয়।

সব্যসাচী লেখক

- যে সাহিত্যিক সাহিত্য ও শিল্পের সকল অঙ্গনে সমান দক্ষতার পরিচয় দেন তাঁকে সব্যসাচী লেখক বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে সব্যসাচী লেখকগণ হচ্ছেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসু এবং সৈয়দ শামসুল হক। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে সৈয়দ শামসুল হক সাহিত্যিক ভাষায় মূলত সব্যসাচী লেখক নন। তাঁর প্রথম দিকের লেখাগুলো তাঁর ভাইয়ের 'সব্যসাচী প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত হওয়ায় মূলত তাঁর ভক্তরা তাঁকে সব্যসাচী লেখক বলে থাকেন।

সৈয়দ শামসুল হক

- **কাব্যগ্রন্থ:** একদা এক রাজ্যে, বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালা, **পরানের গহীন ভিতর (আঞ্চলিক ভাষায়)**, কাননে কাননে তোমারই সন্ধানে, আমি জন্মগ্রহণ করিনি ইত্যাদি ।
- **কাব্যনাট্য: পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়** (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক) , **নুরুলদীনের সারা জীবন**, ঈর্ষা, গণনায়ক , যুদ্ধ যুদ্ধ ।
- **গল্প:** তাস , আনন্দের মৃত্যু, জলেশ্বরীর গল্পগুলো ।
- **উপন্যাস:** অনুপম দিন, সীমান ছাড়িয়ে , **নীলদংশন** (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস), **নিষিদ্ধ লোবান** (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস), সীমানা ছড়িয়ে, খেলারাম খেলে যা।

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

- “পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়” নাটকের চরিত্র হিসাবে রয়েছে মাতবর, পীর সাহেব, মাতবরের মেয়ে , পাইক, গ্রামবাসী, তরুণ দল ও মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাদের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠাকে কেন্দ্র করেই নাটকের পটভূমি তৈরি হয়েছে।কাব্যনাট্যটি মূলত মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ও শুরুর সময়কার ঘটনাকে উপজীব্য করে রচিত।

- নাটকের চরিত্রগুলোর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বিভীষিকা, নারী নির্যাতন , পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অনাচার, রাজাকারদের পাকিস্তানি সেনাতোষণ, সাধারণ মানুষের বিপ্লব ও জেগে ওঠার বার্তাই ফুটে উঠেছে।মুক্তিযুদ্ধ চলছে । কালীপুর, হাজীগঞ্জ কিংবা ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী থেকে মানুষ আসছে । দলে দলে । “মানুষ আসতে আছে যমুনার বানের লাহান/ মানুষ আসতে আছে মহররমে ধূলার সমান”। নারী, পুরুষ, শিশু- সবাই । আসেন একজন পীর সাহেবও । সবাই জড়ো হয় গ্রামের মাতবরের বাড়িতে । উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে সবাই মাতবরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে । এই মাতবরই হচ্ছেন নাটকের প্রধান চরিত্র । তিনি মূলত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী, অর্থাৎ রাজাকার । গ্রামবাসীর সংলাপের মধ্যে দিয়ে নাটকটি শুরু হয় । তাদের সংলাপেই ধরা পড়ে তৎকালীন সময় আর প্রতিকূল-পরিস্থিতি ।

- হতবিহ্বল গ্রামবাসী মুক্তিযুদ্ধকালে নিজেদের করণীয় কিংবা বাঁচার উপায় মাতবরের কাছে জানতে চায় । গ্রামবাসী পাকিস্তানিদের ভয়াবহতার বিষয়টি মাতবরের কাছে উপস্থাপন করে । কিন্তু মাতবর যে পাকিস্তানপন্থী, সেটা গ্রামের সহজ-সরল মানুষ শুরুতে আন্দাজ করতে পারে না । গ্রামবাসীর ধারণা, মাতবর ক্ষমতার অধিকারী । তাই একমাত্র তিনিই পারেন ভয়াবহ এ বিপদ থেকে সবাইকে রক্ষা করতে । মাতবর একপর্যায়ে তাদের আশ্বস্ত করেন, গত রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তার দেখা ও আলাপ হয়েছে । তাই মাতবর সবাইকে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর ভরসা রাখার জন্য বলেছেন । পাশাপাশি মুক্তিবাহিনী থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন । তবে মাতবরের আশ্বাসের পরও গ্রামবাসীর মনের দ্বিধা দূর হয় না । এমনই এক সময়ে মাতবরের মেয়ে ঘরের বাইরে এসে জানায়, তার বাবা মূলত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দোসর। জোর করে গত রাতে তাকেও মাতবর পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

- মাতবর ও তার মেয়ে এবং গ্রামবাসীর একের পর এক সংলাপে মুক্তিসংগ্রামের বিষয়গুলো পরিস্ফুটিত হতে থাকে । মাতবর গ্রামবাসীকে জানান, তার মেয়েকে তিনি এক রাতের জন্য হলেও পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন । একপর্যায়ে মাতবরের মেয়ে অপমানে -লজ্জায় বিষপানে আত্মহত্যা করে । ঘটনা এগোতে থাকে । গ্রামের মানুষ মাতবরের মৃত্যু চায় । এদিকে মাতবরের কানে বারবার পায়ের আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে । এই আওয়াজ আসলে মুক্তিযোদ্ধাদের পদধ্বনি ।

নূরলদীনের সারাজীবন

- 'নূরলদীনের সারাজীবন' নাটকের কাহিনী, ঘটনা এবং পটভূমি লেখকের সমসাময়িক কোনো বিষয় নয়। এই কাব্যনাটকের বিষয় ঐতিহাসিক। ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ১৭৮৩ সালে জানুয়ারি মাসে জমিদার-জোতদার এবং কোম্পানির কুঠিয়ালদের অত্যাচার, অবর্ণনীয় শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে রংপুরের উত্তরাঞ্চলে যে প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু হয়। সৈয়দ হক মূলত সেই কৃষক বিদ্রোহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গণমানুষের মুক্তির যে সংগ্রামী চেতনার জাগরণমূলক আত্মপ্রত্যয় ও লক্ষণ দেখতে পান; তা-ই তাঁর এই কাব্যনাটকের মূলসুর।

নিষিদ্ধ লোবান

- **‘সৈয়দ শামসুল হক** “নিষিদ্ধ লোবান” রচনা করেছেন **১৯৭৯** সালের আগস্ট মাসে। নিষিদ্ধ লোবান’ উপন্যাসটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে বই আকারে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় **১৯৮১** সালে । ২০১১ সালে এই উপন্যাসের অবলম্বনেই নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু নির্মান করেছেন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র **“ গেরিলা”** ।

- চরিত্র: ”নিষিদ্ধ লোবান” উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র **বিলকিস ও সিরাজ** ।